ভোরের কাগজ

তারিখ 31 JAN 2006
পৃষ্ঠা কলাম

[illegible] বই পৌঁছেনি সকল প্রাথমিক স্কুলে

এবার তাও হচ্ছে না। তিনি বললেন, প্রতিদিন শিশুরা আমার কাছে আসছে নতুন বইয়ের আশায়, কিন্তু আমরা তাদের প্রাপ্য বই দিতে পারছি না। ঠিক একই কথা বললেন, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম মোস্তফাও। তিনি অবশ্য জানালেন, আজ-কালের মধ্যে অর্ধেক বই দিতেও পারে।

শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের বই পৌঁছেনি নগরীর অন্যতম নামকরা স্কুল মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলানগর সরকারি বালক বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ রাজধানীর প্রায় অর্ধেক বিদ্যালয়ে। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুতিনদিন ধরে তাদের বই দেওয়ার তারিখ দেওয়া হলেও বই দেওয়া হয়নি। স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষিকাকে না পেয়ে কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, থানা শিক্ষা অফিস থেকে তারিখ দিয়েও বই দেওয়া হয়নি।

সরকার তো দাবি করেছে সব স্কুলে বই পৌঁছে গেছে তাহলে বই পাচ্ছেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বই পৌঁছেছে এ খবর কেবল বিটিভির সংবাদেই দেখানো হয়েছে। অন্য কোথাও নয়। এদিকে বই পৌঁছেছে এমন স্কুলগুলোতেও পৌঁছেছে মোট বইয়ের অর্ধেক। আবার এর অর্ধেক হলো পুরোনো বই।

গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক নাসিমা আখতার বলেন, মাত্র বই পেলাম। তাও প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক। অধিকাংশ স্কুল প্রধানরা পাঠ্যপুস্তক বিতরণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, রাজধানীসহ সারা দেশে সরকারি স্কুলগুলোতে সাধারণত গরিব শিশুরা পড়ালেখা করে, সুতরাং তাদের প্রাপ্য বই নিয়ে নৈরাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সুখকর নয়।

সরকারি স্কুলগুলোতেই যখন এই অবস্থা তখন রাজধানীসহ সারা দেশের বেসকরারি ও কমিউনিটি স্কুলগুলোতে আদৌ বই পৌঁছবে কিনা এমন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। গত কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা থেকে এ খবর পাওয়া গেছে। দেশের বিভিন্ন থানায় এমনকি জেলা শহরের স্কুলগুলোতেও চলছে ভয়াবহ বইসংকট। সরকারের দাবি অনুযায়ী গত ডিসেম্বর মাসে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে বই পৌঁছলেও আজ পর্যন্ত বই পায়নি দেশের লাখ লাখ শিশু। যাদেরকেও দেওয়া হয়েছে তারাও পেয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের বই। তাও আবার প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক।

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নতুন বছরে নতুন বই পাওয়ার কথা থাকলেও মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় বই পৌঁছেনি অর্ধেকের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপজেলায় সরকারি-বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট স্কুল ১৭৮টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজার। জানা গেছে, এখানে তৃতীয় শ্রেণীতে বইসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। উপজেলার তৃতীয় শ্রেণীর ৮ হাজার ৮৫০ জন শিশুর মধ্যে বই পেয়েছে মাত্র ২ হাজার ৪০০ জন। প্রায় একই অবস্থা গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, রাজধানীর পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক বই বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার অর্ধেকই হলো পুরোনো বই। একই অবস্থা গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার বিভিন্ন স্কুলেও।

গত কয়েকদিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে পুরোনো জীর্ণশীর্ণ ছেঁড়া পাঠ্যবই। অসংখ্য বইয়ের ভেতরে ছেঁড়াকাটা এবং বইয়ের ফর্মাগুলো উল্টোপাল্টা করে বাঁধাই করা। পুরোনো বইয়ের কভার পাল্টিয়ে '২০০৬ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য' প্রিন্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিভাবক ও কোমলমতি শিশুরা এসব বই হাতে নিয়েই হতাশ হয়ে পড়েছেন।

মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার নবগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী 'সমাপ্তি' টেলিফোনে জানালো তার হতাশার কথা। সমাপ্তি বললো, আমাদের অনেকগুলো পুরোনো বই দিয়েছে; যার লেখা ঠিকমতো বোঝা যায় না। একই কথা বললো তার কোন উমা।

বই হাতে নিয়ে এই শিশুদের মতোই হতাশ খোদ রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিশু ও তাদের অভিভাবক। এই শিশুদের মতো হতাশ মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সীমা, রুখসানা, সুইটিসহ অগণিত শিশু।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণ খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ সব তথ্য। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একাধিক কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন, নতুন শিক্ষাবর্ষের বইয়ের টেন্ডার পেয়েছে-এমন প্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধেকই সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের মালিকানাধীন। টেন্ডার পাওয়া ২০০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অনেকেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে যখন এনসিটিবির মাধ্যমে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে তারা বই পৌঁছে দেন, তখনই মূলত সরকার সমর্থক গুটিকয়েক প্রকাশকের মাধ্যমে বই কালোবাজারে চলে যায়। আর এই দুর্নীতিতে ভাগ বসান এনসিটিবির কতিপয় কর্মকর্তা।

বিতরণ করা পুরোনো বই প্রসঙ্গে তারা জানালেন, এগুলো হলো সরকার সমর্থক কয়েকজন প্রকাশকের গুদামে থাকা পুরোনো বই। যেগুলো কভার পাল্টিয়ে '২০০৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য' এ সিল দিয়ে জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একাধিক প্রকাশক দাবি করেন, চাহিদার তুলনায় এ বছর বই ছাপার পরিমাণ খুবই কম। এ বছর বই ছাপা হয়েছে ৬ কোটি ৫৩ লাখ ৪৭ হাজার ১১৬ কপি। যাতে ব্যয় হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা। গত বছর ছাপা হয়েছিল ৬ কোটি ৭৬ লাখ ৫০ হাজার কপি। এনসিটিবির একাধিক সূত্রও একই দাবি করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে যখন কালোবাজারে বই বিক্রির অভিযোগ ওঠে তখনই ধারণা করা হয়েছিল এবার বইসংকট আরো প্রবল হবে। কারণ যে বইগুলো ওখানে (কালোবাজারে) বিক্রি হচ্ছে তা বিতরণ করার জন্য তৈরি বইয়েরই অংশ।

এদিকে গত কয়েকদিন রাজধানীর বিভিন্ন বইয়ের বাজার ঘুরে কালোবাজারে বই বিক্রির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ব্যবসায়ী অতি উৎসাহী হয়েই দাবি করেন, সব বই-ই তাদের কাছে আছে। তবে অনেক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, গত মাসে পত্রিকায় লেখালেখির পর সরকার কিছুটা সজাগ হয়েছে। কিন্তু এখন আবার আগের অবস্থায় চলে গেছে।

নীলক্ষেত বাকুশাহ মার্কেটে 'সূচনা বুক সেন্টারে' গিয়ে কথা হলো দোকানের মালিক মোঃ আলমগীর কবিরের সঙ্গে। বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, আপনারা কালোবাজারে বই বিক্রি নিয়ে কিছু একটা করুন। 'বিক্রয়ের জন্য' সিল দেওয়া বোর্ডের একটি বই (৪র্থ শ্রেণীর অংক) দেখিয়ে তিনি বলেন, এটা বিক্রি করার জন্য এবার ছাপা হয়েছে। কিন্তু গুটিকয়েক দোকান ছাড়া এটি পাওয়া দায়। কারণ জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, পুরো প্রক্রিয়াই চলছে কালোবাজারিদের মাধ্যমে। আলমগীর কবির জানালেন, আমরা বইটি বিক্রি করছি ২১ টাকায়। কিন্তু যারা অবৈধ বই ('বিক্রয়ের জন্য নহে' চিহ্নিত) বিক্রি করছে তারা বইটি আরো কম দামে দিচ্ছে।

একই রকম অভিযোগ বাংলাবাজারের নিউ ওয়ার্ল্ড বুক হাউস, শান্তাবুক ভিলা, বুক হাউস, নীলক্ষেতের শতদল বুক স্টোরসহ অসংখ্য বই দোকানের মালিকের। এসব দোকানের মালিকরা জানালেন, বর্তমানে মোট বইয়ের প্রায় ৮০ ভাগ বই কালোবাজারে পাওয়া যাচ্ছে নীলক্ষেতে সন্তানের জন্য বই কিনতে এসেছিলেন ধানমন্ডির শাহজাহান খান রাজাবাজার থেকে এসেছিলেন হাসনা হেনা ও তার স্বামী রবিউল হুসাইন। এখানে কেন এসেছেন জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, সন্তানদের স্কুলে বই পৌঁছেনি। কিন্তু জানতে পারলাম এখানে বই পাওয়া যায়। তাই অবৈধ বই হলেও কিনতে বাধ্য হচ্ছি। জানা গেলো, তাদের সন্তানরা তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

ব্যবসায়ীদের অভিমত, প্রধানমন্ত্রীর বই বিতরণ উদ্বোধনের আগেও এসব বই বিক্রি হয়েছে। কিন্তু সামান্য। কারণ অভিভাবকরা ভেবেছিলেন স্কুলে তো বই পাওয়া যাবেই, তাহলে আর কেনা কেন? কিন্তু এখন বই না পাওয়ায় এবং ভবিষ্যতে বই না পাওয়ার আশঙ্কায় অভিভাবকরা বই কিনতে ভিড় করছেন।

বাংলাবাজারের নিউ ওয়ার্ল্ড বুক হাউসে তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ের জন্য বই কিনতে এসেছিলেন মোঃ শামসুল আলম। তিনি জানালেন, তার সন্তান বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। সেখানে এখনো বই পৌঁছেনি। দোকানটিতে বই চাইতেই বিক্রেতা সজল বললেন, বোর্ডের বই আমাদের দোকানে নেই। তবে খোঁজ নিয়ে প্রায় অর্ধেক দোকানেই পাবেন।

নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এই নৈরাজ্যকর অবস্থার ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহসানুল কবিরকে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, প্রত্যেক স্কুলেই বই চলে গেছে। অনেক স্কুল এখনো বই পায়নি জানালে তিনি বলেন, এ দায় আমাদের নয়। আমাদের দায়িত্ব জেলা পর্যন্ত পৌঁছানো। বর্তমান সংকটের জন্য আমরা দায়ী নই। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর এখন দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে তার অফিসে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার মোবাইল নম্বরে বারবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

জানা গেছে, এ বছর ৮৬ হাজার ৭৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বই ছাপা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৭ হাজার ৬৭১টি সরকারি, ১৯ হাজার ৪২৮টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড, ১৬ হাজার ৭০টি নন রেজিস্টার্ড এবং ২৭ হাজার ৯৬৮টি অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে এ মুহূর্তে শঙ্কিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২ কোটি শিশু ও তাদের অভিভাবকরা।